بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ই ডিসেম্বর, ২০১৫ মোতাবেক ১৮ই ফাতাহ্ ১৩৯৪ হিজরী শামসী তারিখের জুমুআর খুতবা।

তাশাহুদ, তাঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবি যখন করেছে সেই থেকে আজ পর্যন্ত আহমদীয়াত বিরোধীরা বা নামধারী আলেম-উলামা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি করে আসছে এবং অপবাদ দিয়েই চলছে। যাহোক এটি তাদের স্বভাব, এমনটি তারা করতেই থাকবে। কিন্তু এভাবে তারা সাধারণ মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করছে বা পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সবচেয়ে বড় অপবাদ, যা মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিতে উস্কানী দেয় এবং তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে এরা আরোপ করে থাকে তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নাকি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে নিজেকে বড় মনে করতেন, নাউযুবিল্লাহ । বরং স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসব আলেম-ওলামার মিথ্যাচার এবং অন্যায়ের বেসাতী দেখুন! এরা বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নাঊযুবিল্লাাহ মহানবী (সা.) সম্পর্কে এমন কিছু উক্তি করেছেন যাতে তাঁর অবমাননা হয়েছে। তারা যে-যে স্থানেই সুযোগ পায়, যেখানেই তারা নিজেদেরকে শক্তিশালী দেখে, সেখানেই সাধারণ আহমদীদের ওপর এই অপবাদই আরোপ করে যে, নাঊযুবিল্লাাহ্ আহমদীরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বড় মনে করে থাকে। পুণ্য প্রকৃতির যেসব মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করেছে, জামাতের পুস্তকাদি পড়েছে বা তাঁর উক্তি ও বক্তৃতাদি শুনেছে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পেরেছে, নামধারী এবং নৈরাজ্যবাদী এসব আলেমরা শুধুই নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এহেন অপবাদ দিয়েছে বা এ ধরণের কথাগুলো বলেছে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যা তাঁর বিভিন্ন বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আ.) কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদাকে দেখতেন, এ সংক্রান্ত সকল উদ্ধৃতি এ মূহুর্তে তুলে ধরা সম্ভব নয়, আর না তাঁর সব গ্রন্থ ও পুস্তিকা থেকে সমস্ত উদ্ধৃতি এখন উপস্থাপন করা যেতে পারে। অবশ্য বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক তিনি (আ.) যখন রচনা করেন তখন থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুকাল বা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রচিত শেষ পুস্তকের উদ্ধৃতি অবশ্য আমি উপস্থাপন করবো, যাতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র অবস্থান ও পদমর্যাদার ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সময় কালের মধ্যে রচনা করেছেন যা রূহানী খাযায়েনের প্রথম খন্ডে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এতে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন,

মহানবী (সা.) এর সর্বোচ্চ ও সুমহান মর্যাদা

“এখন আকাশের নীচে বিদ্যমান নবী কেবল একজন আর ঐশী গ্রন্থও মাত্র একটিই। অর্থাৎ, সব নবীর চেয়ে বড় মর্যাদাশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি অন্য সব রসূলের চেয়ে যিনি অধিকতর পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ মানব আর খাতামান নবীঈন যার আজ্ঞানুবর্তিতায় ও অনুসরণে খোদাপ্রাপ্তি ঘটে এবং অমানিশার পর্দা অপসারিত হয়ে ইহ জগতেই সত্যিকার পরিত্রাণ লাভের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। এছাড়া কুরআন শরীফ হলো পবিত্র সেই ঐশী গ্রন্থ, যা খাঁটি ও উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশনা এবং সর্বমহান প্রভাব সম্বলিত, যার মাধ্যমে ঐশী জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শন লাভ হয়, মানবীয় দুর্বলতা থেকে হৃদয় পবিত্র হয় আর মানুষ অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য এবং সন্দেহের বেড়াজাল থেকে নিস্কৃতি লাভ করে হাক্কুল ইয়াকীন বা প্রকৃত সত্য-ভিত্তিক অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস অর্জন করে ।” (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খণ্ড রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৫৫৭-৫৫৮ টিকা-পাদটিকা ৩)

অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা, খোদা তা’লার পবিত্র শক্তি বা ক্ষমতা, তাঁর একত্ববাদ, কুরআনের মাহাত্ম্য আর একইসাথে কুরআন যে খোদার বাণী, যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সে সংক্রান্ত দৃঢ় বিশ্বাসও অর্জিত হয়।

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থেই পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **“এই অধমও মহা-মর্যাদাশীল সেই রসূলের তুচ্ছ দাসদের অন্তর্গত যিনি রসূলগণদের সর্দার এবং সব রসূলের শিরোমনি।”**(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড রূহানী খাযায়েন প্রথম খন্ড পৃ:৫৯৪ টিকা-পাদটিকা ৩)

১৮৮৬ সনে স্বীয় গ্রন্থ ‘সুরমা চশমায়ে আরিয়া’য় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আ.) আরও লিখেন,

“বস্তুত আল্লাহ্ তা’লার ওহী এমনই এক আয়না, যাতে খোদা তা’লার অনুপম গুণাবলীর চেহারা যে নবীর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় তাঁর অভ্যন্তরিন স্বচ্ছতা অনুসারে প্রকাশ পায় ।” (অর্থাৎ হৃদয়ের স্বচ্ছতা বা নবীদের আভ্যন্তরিন অবস্থা অনুসারেই আল্লাহ্ তা’লার গুণাবলী প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, **“যেহেতু মহানবী (সা.) নিজের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, বক্ষের প্রশস্ততা, নিষ্কলুষতা ও লজ্জাবোধ, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা, খোদাতে আস্থা ও বিশ্বস্ততা আর খোদাপ্রেমের জন্য আবশ্যকীয় সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে সকল নবীর চেয়ে অগ্রগামী, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বমহান, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বোচ্চ, সর্বোজ্জ্বল এবং সবচেয়ে বেশী পবিত্র ছিলেন, তাই মহা মহিমান্বিত খোদা শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ সৌরভে তাঁকেই (সা.) সবচেয়ে বেশি সুরভিত করেছেন।”** (সবচেয়ে বেশি অংশ পেয়েছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লহ্ (সা.)। **“আর সেই বক্ষ ও হৃদয় যা পূর্বাপর সবার বক্ষ এবং হৃদয় থেকে ছিল অধিকতর প্রশস্ত, অধিক পবিত্র, অধিক নিস্পাপ-নিষ্কলুষ ও বেশী উজ্জ্বল (যার সুবাদে) তা এমন ওহীর নাযিলস্থল হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে, যা পূর্বাপর সবার ওহীর চেয়ে বেশি দৃঢ়, সর্বোৎকৃষ্ট, সবচাইতে মহান এবং পরিপূর্ণ হয়ে ঐশী গুণাবলী প্রকাশের জন্য এক অত্যন্ত স্বচ্ছ, প্রশস্ত এবং বিশাল আয়নাস্বরূপ ।”** (সুরমা চশমায়ে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ:৭১, টিকা)

পুনরায় ১৮৯১ সনে স্বীয় পুস্তিকা তওযীহে মরাম-এ খোদা তা’লার ওহীর পরম বিকাশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

“এই অবস্থায় (অর্থাৎ ঐশী বাণীর সুমহান বিকাশের ফলশ্রুতিতে বিরাজমান অবস্থা) পৃথিবীতে কেবল এক ব্যক্তিই ধন্য হয়েছেন যিনি পূর্ণ মানব, যার সত্তায় সকল মানবিক (গুণাবলীর) ধারা পরম মার্গে পৌঁছেছে এবং মানবীয় যোগ্যতাবলীর বৃত্ত পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ যত মানবীয় শক্তি-বৃত্তি ও সামর্থ রয়েছে তার সবটা পরম রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর তা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টির ক্রমোন্নতি রেখার শীর্ষ বিন্দু (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা যে মানব সৃষ্টি করেছেন, একটি রেখা টেনে যদি তা দেখানো হয়, তাহলে তা হবে উক্ত রেখার চুড়ান্ত প্রান্ত) যা সকল প্রকার উচ্চতার সর্বোচ্চ বিন্দু। (যে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গিয়েছে- তিনি বলেন) **ঐশী প্রজ্ঞার হাত তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর ও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে সৃষ্টির ক্রমধারাকে সেই সর্বোন্নত স্তরে উপনীত করেছে যার নাম অন্য শব্দে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। যার অর্থ হলো, পরম প্রশংসিত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের পরম বিকাশস্থল। অতএব প্রকৃতিগত দিক থেকে সে নবীর মর্যাদা যেমন সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনিভাবে বাস্তবেও তাঁকে দান করা হয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ের ওহী বা ঐশী বাণী এবং ভালোবাসার সর্বমহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তও হয়েছেন তিনিই (সা.)। [তিনি (আ.) বলেন,] এটি সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা যেখানে না আমি (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ) পৌঁছুতে পারি, না মসীহ্ নাসেরী [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)] পৌঁছুতে পারেন।** (তওযীহে মরাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

এরপর রয়েছে ১৮৯২-৯৩ সনের রচনা, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম যা রূহানী খাযায়েনের ৫ম খণ্ডে রয়েছে । এর দু’টো অংশ আছে, একটি অংশ উর্দূ অপরটি আরবী। এতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

“সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি যা মানবকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানবকে, যা ফিরিশ্তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীগুলোতেও ছিল না, ছিল না মণি- মানিক্যে, পদ্মরাগ মণিতে, চুনিপান্না এবং হীরা-জহরতে। মোটকথা, আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুতেই তা ছিল না। তা ছিল কেবল মানবের মাঝে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সবচাইতে পরিপূণ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ এবং সবচাইতে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকূল শিরোমনি, জীবন প্রাপ্তদের সর্দার মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। অতএব সে নূর বা জ্যোতি দান করা হয়েছে সেই মানবকে এবং পদমর্যাদার নিরিখে তার রঙ্গে-রঙ্গীন লোকদেরকেও অর্থাৎ তাদেরকে যারা কিছুটা হলেও সেই রঙ ধারণ করেছেন। আমানত বলতে শ্রেষ্ঠ মানবের সেসকল শক্তি-বৃত্তি, বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান, মন-প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ভয়, ভালোবাসা, সম্মান-প্রতিপত্তি এবং সকল আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নিয়ামতকে বোঝায় যা আল্লহ্ তা’লা পূর্ণ মানবকে [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে] দান করেছেন। আর সেই পূর্ণ মানব এই আয়াত إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (সূরা আন্ নিসা: ৫৯) **অনুসারে সেই সকল আমানত আল্লাহ্ তা’লাকে প্রত্যার্পণ করেন।** (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা বলছেন, ‘আমানত’ যোগ্য ব্যক্তির হাতে সোপর্দ কর। আর আল্লাহ্ তা’লা যেসব আমানত ন্যস্ত করেন সেসব আমানতের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানত হলো, আল্লাহ্ তা’লার প্রাপ্য প্রদান করা। আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের মাধ্যমে, আমানত প্রত্যার্পণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পদমর্যাদা মহানবী হযরত মুহাম্মদ

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর। তিনি (আ.) বলেন, **"সব আমানত আল্লাহ্ তা'লাকে প্রত্যার্পণ করে) অর্থাৎ তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে তাঁর পথে নিজেকে উৎসর্গ করে।"**(আল্লাহ্ তা'লাকে আমানত ফেরত দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিলীন হয়ে নিজের জীবনকে খোদার কাজের জন্য উৎসর্গ করা। আল্লহ্র ধর্মের প্রসার এবং প্রচারের জন্য, তাঁর ইবাদতের জন্য, তাঁর নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে— তিনি (আ.) বলেন), **"ইসলামের মর্ম-তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি যে, এই মর্যাদা সবচেয়ে মহান সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল আমাদের নেতা ও মনিব, আমাদের পথপ্রদর্শক, নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাঝে; যিনি পরম সত্যবাদী ও সত্যায়িত। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলেন,**

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আনআম: ১৬৩)

وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (সূরা আল্ আনআম: ১৬৪)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (সূরা আল্ আনআম: ১৫৪)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ (সূরা আলে ইমরান: ২১)

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল্ মু'মেন: ৬৭)

বিভিন্ন সূরা থেকে নেয়া এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, (পুরো অনুবাদ করেন নি বরং আয়াতের আংশিক অনুবাদ করেছেন) **অর্থাৎ তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমার নামায আর ইবাদত প্রতিষ্ঠায় আমার চেষ্টা-সাধনা, আমার ত্যাগ স্বীকার, আমার জীবন এবং মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর পথে নিবেদিত। সেই খোদা যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী আমি-ই অর্থাৎ পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মতো অন্য কোন কামিল মানব নেই যে এভাবে শতভাগ আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিবেদিত হবে (অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মতো)। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযাযেন, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৮০-১৬২)**

এরপর ১৮৯৪ সনে স্বীয় গ্রন্থ 'নুরুল হক্ব'-এর প্রথম অংশে তিনি (আ.) বলেন, (এটি রূহানী খাযায়েনের অষ্টম খণ্ড।) আরবী বাক্যটি হলো,

طوبى للذى قام لاعلاء كلمة الدين ونحض يستقرى طرق مرضاة الله النصير المعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ والصلوة والسلام على سيد رسله۔

(উচ্চারণ: তূবা লিল্লাযি ক্বামা লেই'লায়ে কালেমাতিদ্ দ্বীনে ওয়া নাহাযা ইয়াসতাকরী তুরুকান মারযাতিল্লাহিন্ নাসীরিল মুঈন। বিসমিল্লহির রহমানির রহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সাইয়্যেদে রুসূলিহি)

"আশিসমন্ডিত সেই জন, ধর্মের সাহায্যের জন্য যে দণ্ডায়মান হয়েছে এবং খোদার সন্তুষ্টির পথ চেয়ে প্রতীক্ষারত রয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি সমগ্র

বিশ্ব জগতের প্রমাণিত প্রভু-প্রতিপালক। দরূদ এবং শান্তি তাঁর নবীদের সর্দার বা নবী নেতার প্রতি।" (নূরুল হক, প্রথম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২)

এরপরের উদ্ধৃতি ১৮৯৪ সনে রচিত ইতমামুল হুজ্জাহ্ পুস্তিকা থেকে যা রূহানী খাযায়েনের অষ্টম খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত — তিনি (আ.) বলেন, **"সেই মানব, যিনি সবচেয়ে পরিপুর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম মানব ছিলেন, পূর্ণ নবী ছিলেন আর সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর হাতে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও আধ্যাত্মিক হাশর ঘটে যাওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে পুরো মৃত এক জগৎ জীবন ফিরে পায়; আশিসপূর্ণ সেই নবী হলেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া, মনোনীতদের ইমাম, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব— হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এ প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর যেমনটি পৃথিবী সৃষ্টি অবধি তুমি অন্য কারো প্রতি নাযিল করনি। মহা-মর্যাদাবান এ নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত না হলে ছোট ছোট যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন, যেমন- ইউনুস, আইয়ুব, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, মালাকি, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ নবীগণের সত্যতার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে থাকতো না, যদিও তারা সবাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত এবং খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন ছিলেন। এটি কেবল সেই নবী (সা.)- এরই অনুগ্রহবিশেষ যে, এসব নবীও পৃথিবীতে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। হে আল্লহ্! তাঁর (সা.) প্রতি, তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং তাঁর সাহাবীদের সবার প্রতি, তুমি দরূদ, রহমত ও আশিষ বর্ষণ কর। ওয়া আখেরুদ দাওয়ানা আনিলহামদুল্লিাহি রাব্বিল আলামিন।"।** (ইতমামুল হুজ্জাহ্ রূহানী খাযায়েন ৮ম খন্ড পৃ.৩০৮)

পুনরায় ১৮৯৫ সনে তাঁর প্রণীত পুস্তক 'আরিয়া ধরম' এ তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের ধর্মের বিরোধীরা (অর্থাৎ ইসলাম বিদ্বেষীরা) ভিত্তিহীন নিছক রেওয়ায়েত ও অমূলক কল্প-কাহিনীর ওপর নির্ভর করে, আমাদের গৃহীত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর দৃষ্টিকোন থেকে আদৌ যা প্রমাণিত নয় বরং তা মুনাফিকদের মনগড়া মিথ্যা; তা আমাদের মর্মযাতনা দিয়ে থাকে এবং এসব কথার মাধ্যমে আমাদের নেতা ও অভিভাবক মহানবী (সা.) এর অবমাননা করে, আরো বার বেড়ে একে গালি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছাড়ে অথচ আমাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এসবের নাম-গন্ধও নেই । এর চেয়ে বড় মর্মযাতনার কারণ আর কী হতে পারে যে, ভিত্তিহীন কয়েকটি অপবাদ উত্থাপন করে তারা আমাদের নেতা ও মনিবে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে নাঊযুবিল্লহ্ ব্যভিচার এবং পাপাচারের অপবাদ আরোপ করতে চায়, যাঁকে (সা.) আমরা আমাদের পুরো গবেষণার ভিত্তিতে নিষ্পাপদের সর্দার আর সেই সব পবিত্রদের শিরোমনি মান্য করি যারা নারীগর্ভে জন্ম নিয়েছেন। এবং তাঁকে খাতামান্নাবীঈন মানি কেননা তাঁর সত্ত্বায় নবুয়্যত, সকল পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পরম রূপ পরিগ্রহ করেছে।"** (আরিয়া ধরম, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪)

এরপর তাঁর (আ.) ১৮৯৭ সনের পুস্তক হল, 'সিরাজে মুনীর' এতে তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"আমরা যখন ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকাই তখন সমগ্র নবুওতের ধারায় কেবল এক সুপুরুষকেই সুমহান সাহসিকতাপূর্ণ, অমর ও আল্লহ্ তা'লার অতীব প্রিয় নবী হিসাবে দেখতে পাই- অর্থাৎ নবীকূল-সর্দার, রসূলদের গৌরব, সমস্ত প্রেরিত পুরুষের মাথার সেই মুকুট-যাঁর নাম হলো মুহাম্মদ মোস্তফা ও**

আহমদ মুযতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। যাঁর ছায়াতলে দশটি দিন অতিবাহিত করে এমন জ্যোতিঃ লাভ হয়, ইতোপূর্বে হাজার বছরেও যা পাওয়া সম্ভব হতো না।" (সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮২)

এরপর, তাঁর (আ.) এক পুস্তকের নাম হল কিতাবুল বারীয়্যাহ্ ১৮৯৮ সনে রচিত। এতে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের নবী (সা.)-এর নিদর্শন এবং মু'জিযা দু'প্রকার। একটি হলো তা, যা সরাসরি তাঁর হাতে বা তাঁর কথা, কর্ম বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এমন নিদর্শন সংখ্যার দিক থেকে প্রায় তিন হাজার হবে। দ্বিতীয় প্রকার নিদর্শন হলো তা, যা তাঁর উম্মতের মাধ্যমে সকল যুগে প্রকাশ পায়। এরূপ নিদর্শনাবলীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হবে। এমন কোন শতাব্দী অতিবাহিত হয়নি যাতে এমন নিদর্শন প্রকাশ পায়নি। যেমনটি কি-না এ যুগে, এই অধমের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এই নিদর্শন প্রদর্শন করছেন। সেসব নিদর্শন যার ধারা কোন যুগে বন্ধ হয় না এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে বড় নবী ও সবচেয়ে প্রিয় নবী হলেন, জনাবে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। কেননা অন্যান্য নবীর উম্মত অন্ধকারের অমানিশায় পড়ে আছে, তাদের হাতে শুধু অতীতের কল্পকাহিনীই রয়ে গেছে। কিন্তু এই উম্মত সবসময় আল্লহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিত্য-নতুন নিদর্শন পেয়ে থাকে। একারণে এই উম্মতের বেশিরভাগ তত্ত্বজ্ঞানী এমন, যারা আল্লাহ্‌র সত্তায় এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যেন তারা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুস দেখছেন। আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস অন্যান্য জাতির ভাগ্যে জোটেনি তাই আমাদের হৃদয়ের সাক্ষ্য হলো, কেবল ইসলামই সত্য এবং সঠিক ধর্ম। আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর কোন নিদর্শন দেখিনি। পবিত্র কুরআন যদি সাক্ষ্য না দিত তাহলে আমাদের জন্য এবং সকল গবেষকের জন্য তাঁকে সত্য নবী মনে করা সম্ভব ছিল না। কেননা, কোন ধর্মে যখন শুধু গল্প ও কাহিনীই অবশিষ্ট থেকে যায় তখন সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা অনুসরণীয় নেতার সত্যতা মনগড়া সেসব কাহিনীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে না। এর কারণ হল, শত শত বছরের পুরোনো কাহিনী, নিজের মাঝে মিথ্যার উপকরণও রাখে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিথ্যা হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে, কেননা পৃথিবীতে মিথ্যারই আধিক্য। তাই আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সেসব কাহিনীকে কীভাবে সঠিক ঘটনা বলে মানা যেতে পারে? কিন্তু আমাদের মহানবী (সা.)- এর নিদর্শনাবলী শুধু কাহিনীসর্বস্ব নয় বরং আমরা তাঁর (সা.) আনুগত্যের কল্যাণে এমন নিদর্শন স্বয়ং লাভ করে থাকি। কাজেই দর্শন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে যাই। অতএব, এই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র নবীর মর্যাদা কত মহান, যাঁর নবুয়্যত সকল যুগে সত্য-সন্ধানীদের নিত্য নতুন প্রমাণাদি উপহার দিয়ে থাকে। আর আমরা নিরবচ্ছিন্ন নিদর্শনের কল্যাণে এমন মহান মর্যাদায় উপনীত হই যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে স্বচক্ষে দেখি। অতএব ধর্ম সেটিকেই বলা হয় আর সত্য নবী তিনি, যার সত্যতার বসন্ত নিত্য নতুন রূপে সর্বদা দৃশ্যমান। তাই কেবল এমন কাহিনীর ওপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় যাতে সহস্র সহস্র ধরনের সংযোজন-বিয়োজনের আশংকা থেকে যায়। পৃথিবীতে শত শত মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে, শত শত পুরোনো কাহিনীর ওপর নির্ভর করে এসব লোকদের অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রচার করা হয় বা মানা হয়। কিন্তু আসল কথা হলো, প্রকৃত নিদর্শন প্রদর্শনকারী তিনি যার

নিদর্শনের সমুদ্র কখনও শুকিয়ে যায় না। কাজেই সেই মহান ব্যক্তি হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, মহানবী (সা.)। আল্লহ্ তা'লা সব যুগে এই কামেল ও পবিত্র নবীর নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য কাউকে না কাউকে প্রেরণ করেছেন আর এ যুগে 'মসীহ্ মওউদ' নাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখ! আকাশ থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে, আর বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক বিষয়াদি সাধিত হচ্ছে। সকল সত্য সন্ধানী আমাদের কাছে অবস্থান করে নিদর্শন দেখতে পারে, সে খ্রিস্টান বা ইহুদী বা আর্য যা-ই হোক। আর এসবই আমাদের মহানবী (সা.) এর কল্যাণধারা।" (কিতাবুল বারীয়্যাহ, রূহানী খাযায়েন, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৭, টিকা)

তাঁর ১৯০০ সনের পুস্তিকা **আরবাঈন নাম্বার-১**, যা রূহানী খাযায়েন এর সপ্তদশ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত, এতে তিনি (আ.) বলেন: **"আমি সত্য সত্যই বলছি, পৃথিবীতে একমাত্র পূর্ণ মানব তিনিই অতিবাহিত হয়েছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়া গৃহীত হওয়া এবং অন্যান্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা আজ পর্যন্ত উম্মতের সত্যিকার অনুসারীদের মাধ্যমে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর স্রোতধারার মতো বহমান রয়েছে। ইসলাম ছাড়া এরূপ ধর্ম আর কোথায় যা এই বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি নিজের মাঝে ধারণ করে? আর সেসব লোক কোথায় বা কোন দেশে রয়েছে, যারা ইসলামী কল্যাণরাজি এবং নিদর্শানাবলীর মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে?"** (আরবাঈন নং-১ রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

এরপর তাঁর ১৯০২ সনে লেখা কিশতিয়ে নূহ গ্রন্থে তিনি (আ.) বলেন, **"মানব জাতির জন্য ভূপৃষ্ঠে এখন কুরআন ব্যতীত আর কোন ধর্ম-গ্রন্থ নেই আর আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভিন্ন আর কোন রসূল ও শাফী নেই। তাই তোমরা এই মহামর্যাদাবান ও প্রতাপান্বিত এই মহান নবী (সা.)-এর সাথে সত্যিকার প্রেম-বন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হও এবং অন্য কাউকে কোনভাবেই তাঁর ওপর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পার। স্মরণ রেখো! পরিত্রাণ বা মুক্তি এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবে, বরং প্রকৃত নাজাত বা মুক্তি সেটি যা এই পৃথিবীতেই আপন জ্যোতি প্রকাশ করে। সত্যিকার মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তা'লা সত্য এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এবং পুরো সৃষ্টির মাঝে শাফী বা মধ্যবর্তী যোজক, আর আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের সমমর্যাদার অন্য কোন গ্রন্থও নেই। আল্লহ্ তা'লা অন্য কারও জন্য চাননি যে, সে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হবে, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের জন্য জীবন্ত।** (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ১৩-১৪)।

এরপর তাঁর ১৯০২ সনের অপর পুস্তিকা নাসীমে দাওয়াত-এ তিনি (আ.) বলেন, "**সেই সর্বশক্তিমান, সত্য ও কামেল খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহের প্রতিটি অনু-কণা সেজদা করে, যার হাতে প্রতিটি আত্মা এবং সৃষ্টির প্রতিটি কণা বা অণু তাদের সকল শক্তি-বৃত্তি সহ প্রকাশিত হয়েছে এবং সবকিছুর অস্তিত্ব যার অস্তিত্বের কাছে ঋণী। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর সৃষ্টির আওতার বাইরে নয়। সহস্র সহস্র দরূদ, সালাম এবং রহমত ও আশিস বর্ষিত হোক, সেই পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি যাঁর কল্যাণে আমরা সেই জীবন্ত খোদাকে পেয়েছি** {অর্থাৎ মহানবী

(সা.)-এর মাধ্যমে সেসব গুণাবলীর আধার খোদাকে পেয়েছি যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে যে,)] **যিনি স্বয়ং বাক্যালাপে আপন অস্তিত্বের জানান দিয়ে থাকেন এবং অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখিয়ে আদি এবং কামেল শক্তিতে উদ্ভাসিত চেহারা নিজেই আমাদের প্রদর্শন করেন। অতএব আমরা এমন রসূল (সা.)-কে পেয়েছি যিনি আমাদের খোদা দেখিয়েছেন আর এমন খোদাকে পেয়েছি যিনি স্বীয় মহান শক্তি- বলে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পবিত্র শক্তি কি অসাধারণ মাহাত্ম্যই না নিজের মাঝে ধারণ করে যেটি ছাড়া কোন বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করে না। যার সাহায্য ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্বে টিকে থাকতে পারে না। আমাদের সেই সত্য খোদা অশেষ কল্যাণের আধার, অশেষ ক্ষমতার অধিকারী এবং অশেষ সৌন্দর্যের আধার আর সীমাহীন অনুগ্রহকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন খোদা নেই।"** (নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩)

আর এই খোদা আমরা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছি।

এরপর ১৯০৩ সনের বক্তৃতা 'লেকচার শিয়ালকোট' নামক পুস্তিকায় তিনি (আ.) বলেন, **"বস্তুতঃ এসব ধর্মে এমন সব বিকৃতি বস্তুতই অনুপ্রবেশ করেছে যার কতক উল্লেখের যোগ্যই নয় আর মানবীয় পবিত্রতারও যা পরিপন্থী; আর এসব লক্ষণ ছিল ইসলামের আবশ্যকতার পূর্বশর্ত।** (অতীতের ধর্মগুলোতে যেসব বিকৃতি দেখা দিয়েছে সেসব বিকৃতি ইসলামের প্রয়োজনীয়তার দিকেই ইঙ্গিত করছিল)। তিনি (আ.) বলেন, **একজন বিবেকবানকে স্বীকার করতেই হয়, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে সকল ধর্মই বিকৃতির শিকার ছিল, আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে বসেছিল। অতএব আমাদের নবী (সা.) সত্য প্রকাশের জন্য সবচেয়ে মহান এক মুজাদ্দীদ ছিলেন, যিনি হারিয়ে যাওয়া সত্যকে পুণরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে অন্য কোন নবী অংশীদার নন। অর্থাৎ সারা বিশ্বকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং তমশাচ্ছন্ন পেয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে সেই অমানিশার আধার আলোয় রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি যে জাতির মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যতক্ষণ না সেই জাতি শির্কের পোশাক খুলে একত্ববাদের পোশাক পরিধান করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেননি । শুধু এতোটাই নয়, বরং ঈমানের উন্নত পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে আর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বাসের সেই কর্ম তাদের হাতে সাধিত হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সফলতা এবং এর এমন বিশালতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কোন নবীর ভাগ্যে জোটেনি। এটিই মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের সত্যতার একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন যুগ চরম অমানিশায় আচ্ছন্ন ছিল আর সহজাতভাবে মহান এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আর তিনি (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এমন সময়ে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শির্ক ও প্রতিমা-পূজা পরিহার করে একত্ববাদ এবং সততা অবলম্বন করেনিয়েছে। সত্যিকার অর্থে এই পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি বন্য স্বভাবের পশুতুল্য মানুষগুলোকে** (যে জাতি পশুর মত ছিল এমন জাতিকে) **মানবীয় রীতি-নীতি শিখিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, পশুকে মানুষ বানিয়েছেন আর মানুষকে সুশিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন, আর সুশিক্ষিত মানুষ থেকে খোদাপ্রেমী মানুষ বানিয়েছেন এবং তাঁদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার প্রাণ সঞ্চার করেছেন। সত্য খোদার সাথে তাদের**

সম্পর্ক-বন্ধন রচনা করেছেন। খোদার পথে তাদের মেষপালের ন্যায় জবাই করা হয়েছে এবং পিপীলিকার মত পদদলিত করা হয়েছে কিন্তু তাঁরা ঈমানকে দলিত-মথিত হতে দেননি, বরং সকল সমস্যার মাঝেও সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। অতএব নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় আদম ছিলেন বরং সত্যিকার আদম ছিলেন তিনিই, যার মাধ্যমে এবং যার কল্যাণে সমস্ত মানবীয় শ্রেষ্ঠত্ব পরম মার্গে পৌঁছেছে এবং সকল শক্তি-বৃত্তি নিজ নিজ জায়গায় উত্তম কাজ আরম্ভ করেছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফল-ফুলশূন্য থাকেনি আর নবুয়্যত তাঁর সত্তায় শুধু কালের দিক থেকেই সমাপ্ত হয়নি বরং এ কারণেও হয়েছে যে, নবুয়্যতের সকল শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরাকাষ্ঠা তাঁর মাঝে পরম মার্গে পৌঁছেছে। যেহেতু তিনি ঐশী গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন তাই তাঁর শরীয়ত জালালী এবং জামালী (প্রতাপ ও সৌন্দর্য) উভয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক ছিল এবং তাঁর দু'টো নাম 'মুহাম্মদ' এবং 'আহমদ' রাখার এটিই উদ্দেশ্য। আর তাঁর সার্বজনীন নবুয়্যতে কার্পণ্যের কোন দিক নেই বরং তা আদি থেকেই সারা বিশ্বের জন্য নির্ধারিত ছিল।" (লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ২০৬-২০৭)।

এরপর তাঁর ১৯০৫ সনের গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম খণ্ডে তিনি (আ.) বলেন, "সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য সেই মহিমান্বিত খোদার (প্রাপ্য) যিনি আমাদের এমন ধর্ম দান করেছেন যা খোদাকে চেনা এবং খোদা ভীতির এমন একটি মাধ্যম উপহার দেয়, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন যুগে দেখা যায় না। সহস্র সহস্র দরূদ সেই নিষ্পাপ নবীর প্রতি যাঁর কল্যাণে আমরা এই পবিত্র ধর্মে প্রবেশ করেছি। সহস্র সহস্র রহমত (করুণাবারি) মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রতি যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে এই বাগিচায় পানি সিঞ্চন করেছেন।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃ: ২৫)

পুনরায় বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম খণ্ডেই তিনি (আ.) বলেন, "নূহ্ (আ.)-এর মাঝে সেই সৌন্দর্যই ছিল যাকে মহাসম্মানিত আল্লহ্ মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর সব অস্বীকারকারীকে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।" (হযরত নূহ্ (আ.)-এর জাতিকে আল্লহ্ তা'লা ধ্বংস করেছিলেন, কেননা তারা নবীকে অস্বীকার করেছিল)। "এরপর মূসা (আ.)ও সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নিয়ে এসেছেন যিনি কয়েকদিন কষ্ট সহ্য করার পর অবশেষে ফেরাউনের ধ্বংস ডেকে এনেছেন। এরপর সবার শেষে নবীকূল শিরোমনি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আমাদের মনিব, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যসহ আবির্ভূত হয়েছেন যার প্রশংসায় এই আয়াতই যথেষ্ট যে, دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (সূরা আন্ নাজম: ৯-১০) অর্থাৎ সেই নবী খোদার অতীব নিকটতর হয়েছেন এরপর সৃষ্টির দিকে ফিরে এসেছেন আর এভাবে উভয় অধিকার অর্থাৎ আল্লহ্র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার তিনি পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করেছেন এবং উভয় প্রকার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন এবং উভয় ধনুকের এক তন্ত্রীর মত হয়ে গেছেন। উভয় ধনুকের মধ্যবর্তী লাইন যেমন হয়ে থাকে তাঁর সত্তা তেমনই রূপ ধারণ করে। এই সৌন্দর্যকে নোংরা প্রকৃতির মানুষ ও দৃষ্টিহীনরা দেখেনি। [মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেন, "তাঁর এই পবিত্র সৌন্দর্যকে নোংরা প্রকৃতির মানুষ ও অন্ধরা দেখেনি] যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৯৯) **অর্থাৎ তারা তোমার প্রতি তাকায় কিন্তু তুমি তাদের চোখে পড় না, । অবশেষে সেসব অন্ধ ধ্বংস হয়ে গেছে।"** (পরিশিষ্ট,বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃ: ২২০-২২১)

হকীকাতুল ওহী তাঁর (আ.) ১৯০৭ সনের রচনা, এতে তিনি (আ.) বলেন, **"অতএব আমি সব সময় বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (সা.), সহস্র সহস্র দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি। তিনি কতই না মর্যাদাশীল নবী। তাঁর মহান মর্যাদার পরম মার্গের কথা ধারণাই করা যায় না আর তাঁর পবিত্র প্রভাবের গভীরতার কথা ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপরও নয়। পরিতাপ! তাঁর মর্যাদা যেভাবে শনাক্ত করা উচিত ছিল সেভাবে শনাক্ত করা হয় নি। যেই তওহীদ বা একত্ববাদ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, যিনি পুনরায় পৃথিবীতে তা ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি খোদাকে পরমভাবে ভালোবেসেছেন। আর মানব জাতির প্রতি পরম ভালোবাসায় তাঁর প্রাণ সবচেয়ে বেশি উদ্বেগাকুল থাকত। এজন্য খোদা তা'লা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সব নবী এবং পূর্বাপর সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং তাঁর কাঙ্খিত সব প্রত্যাশাই তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করেছেন। তিনিই সব কল্যাণের উৎসস্থল। যে ব্যক্তি তাঁর কল্যাণ-প্রবাহের কথা স্বীকার না করে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর।"** অথচ এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি অভিযোগ আরোপ করে যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি নাকি রসূলুল্লাহ্র চেয়ে বড় মর্যাদা রাখেন বা মনে করেন যে, আমি তাঁর (সা.) পরে এসেছি, আমি নবী। তিনি (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি রসূলূল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণ বিতরণকারীর মর্যাদা স্বীকার না করে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর।"** এমন মানুষকে মসীহ্ মওউদ (আ.) শয়তানের বশংধর আখ্যায়িত করেছেন। **কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই (সা.) দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক তত্ত্ব-জ্ঞানের ভান্ডার তাঁকে দান করা হয়েছে। যে তাঁর (সা.) মাধ্যমে পায় না, সে চিরবঞ্চিত। আমরা কী আর আমাদের মূল্যই বা কী। এ কথা যদি স্বীকার না করি তাহলে আমরা এই নিয়ামতের অস্বীকারকারী হব যে, প্রকৃত তওহীদ বা একত্ববাদ আমরা এই নবী (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবন্ত খোদাকে আমরা এই মহান নবী ও তাঁর জ্যোতির মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপ এবং কথোপকথনের সম্মান আর যার মাধ্যমে আমরা তাঁর চেহারা দর্শন করি তা এই সম্মানিত নবীর মাধ্যমেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেই হিদায়াতের সূর্য' এর আলোকমালা আমাদের ওপর রৌদ্রজ্জ্বল দিবসের ন্যায় পতিত হয় আর আমরা আলোকিত থাকতে পারি ততক্ষণ যতক্ষণ তাঁর সামনে আমরা দণ্ডায়মান হয়ে উপস্থিত থাকি।"** (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ: ১১৮-১১৯)

হকীকাতুল ওহী গ্রন্থে তিনি (আ.) আরো বলেন, **"এই পুরো বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হল একথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'লা কাউকে ভালোবাসবেন আর এ জন্য যে শর্ত পালন নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাহল, এমন ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, মহানবী (সা.)-এর আন্তরিক অনুসরণ এবং তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা মানুষকে অবশেষে এমনভাবে খোদার প্রিয়ভাজন করে তুলে যে, স্বয়ং তার হৃদয়ে ঐশী প্রেমের এক প্রদাহ সৃষ্টি করেন।**

তখন এমন ব্যক্তি সবকিছুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হয় এবং তাঁর ভালোবাসা এবং আকর্ষণ শুধুই খোদার প্রতি নিবিষ্ট হয়ে থাকে। তার হৃদয়ে খোদার ভালোবাসার এক বিশেষ বিকাশ ও প্রকাশ তখন ঘটে। আর তা তাকে প্রেম এবং ঐশী ভালবাসার রঙে পুরোপুরি রাঙিয়ে গভীর আকর্ষণের সাথে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপর সে তখন জয়যুক্ত হয়। তার সাহায্য এবং সমর্থনে খোদা তা'লার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সকল অর্থে নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ পায়।" (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮)

কিন্তু এটি কেবল তারাই লাভ করে যারা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসে।

পুনরায় হকীকাতুল ওহীতেই তিনি বলেন, "অতএব আমি নিজের কোন ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে নয় বরং সম্পূর্ণভাবে খোদার কৃপায় এই নিয়ামত থেকে পূর্ণ অংশ পেয়েছি যা আমার পূর্বের নবী, রসূল এবং খোদার মনোনীতদের প্রদান করা হয়েছে। আমার জন্য এই নিয়ামত লাভ করা সম্ভব ছিল না, যদি না আমি আমার নেতা, মনিব, নবী কূলের গর্ব ও সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ অনুসরণ ও অনুকরণ না করতাম। অতএব, আমি যা কিছু পেয়েছি সেই আনুগত্যের কল্যাণেই পেয়েছি। আমি আমার প্রকৃত এবং পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, কোন মানুষ সেই নবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ-অনুগমন ছাড়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না আর পরম তত্ত্বজ্ঞানের অংশও পেতে পারে না। সেই বিষয়টি কী যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য ও পূর্ণ অনুসরণের পর সর্বপ্রথমে হৃদয়ে সৃষ্টি হয়? তা আমি এখানে তুলে ধরছি! অতএব স্মরণ রাখা উচিত, তাহলো এক সুস্থ হৃদয় অর্থাৎ সেই হৃদয় যা থেকে জাগতিকতার ভালোবাসা উবে যায়। হৃদয় এক স্থায়ী ও অমর প্রেমের সন্ধানী হয়ে যায়, এরপর এক স্বচ্ছ ও পরম ঐশী-প্রেম এই সুস্থ হৃদয়ের কল্যাণে লাভ হয় আর এসব নিয়ামত মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করা যায়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, যদি খোদা তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আস, আমার অনুসরণ কর যেন খোদা তোমাদের ভালোবাসতে পারেন।" (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

এরপর নিজের ১৯০৮ সনের রচনা চশমায়ে মা'রেফাত-এ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবীতে কোটি কোটি এমন পবিত্র প্রকৃতির মানুষ অতীত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন কিন্তু আমরা সর্বোৎকৃষ্ট, সবচেয়ে মহান ও সর্বাপেক্ষা উত্তম খোদার সেই সুপুরুষকে পেয়েছি যাঁর নাম হলো মুহাম্মদ (সা.) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (সূরা আল্ আহযাব: ৫৭) সেসব জাতির পবিত্র পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও যাদের কথা পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। আমরা কেবল সেসব নবীর সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করি, যাঁদের উল্লেখ কুরআনে আছে। যেমন হযরত মূসা, হযরত দাঊদ, হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণ। খোদার কসম খেয়ে আমরা বলছি, মহানবী (সা.) পৃথিবীতে যদিনা আসতেন এবং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ না হত আর সেসব কল্যাণরাজি আমরা স্বচক্ষে না দেখতাম যা আমরা দেখেছি, তাহলে অতীতের সব নবীর সত্যতা আমাদের কাছে সন্দেহযুক্ত রয়ে যেত। কেননা, শুধু কাহিনীর মাধ্যমে কিছু অর্জিত হয় না আর হয়ত সেই কাহিনীগুলো সঠিকও নয়

অধিকন্তু সেসব নিদর্শন যা তাদের প্রতি আরোপ করা হয় তার সবই হয়ত অতিরঞ্জন কেননা; সেগুলোর কোন নাম চিহ্নও এখন নেই বরং অতীতের গ্রন্থাবলী থেকে খোদা তা'লার অস্তিত্বেরই প্রমান পাওয়া যায় না, আর নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য এটি বোঝা সম্ভবও নয় যে, খোদা মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের কল্যাণে সেসব কল্প-কাহিনী বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখন শুধু কথার কথা নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে আমরা ভালভাবে বুঝি যে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ কাকে বলে আর কীভাবে খোদার নিদর্শন প্রকাশ পায় আর কীভাবে দোয়া গৃহীত হয়। আর এ সবকিছু আমরা পেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে। অন্যান্য জাতি কাহিনীস্বরূপ যা বর্ণনা করে, তার সবই আমরা স্বচক্ষে দেখছি। অতএব আমরা এমন এক নবীর আঁচল আকড়ে ধরেছি যিনি খোদা দর্শনের আয়নাস্বরূপ। জনৈক কবি কতই না সুন্দর এক পঙক্তি লিখেছেন যে,

মুহাম্মদে আরাবী বাদশাহে হা দো সারা,
কারে হ্যায় রূহে কুদুস জিস্ কে দার কি দারবানি
উসে খোদা তো নেহি কেহ্ সাকুঁ পার কেহ্তা হুঁ,
কেহ্ উসকি মর্তবা দানী মে হ্যায় খোদা দানী

আমরা সেই ভাষা কোথায় পাব যার মাধ্যমে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব, যিনি আমাদেরকে এমন এক নবীর আনুগত্য করার সৌভাগ্যে ধন্য করেছেন, সাধুগণের আত্মার জন্য যিনি তেমনই এক সূর্য যেভাবে অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা হয়ে থাকে। তিনি অমানিশার যুগে উদিত হয়ে আপন আলোয় পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি ক্লান্তও হননি শ্রান্তও হননি, যতক্ষণ না আরবের সকল অঞ্চলকে শির্‌ক বা অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি নিজেই নিজের সত্যতার প্রমাণ কেননা, তাঁর আলো সকল যুগেই বিদ্যমান। তাঁর সত্যিকারের আনুগত্য মানুষকে ঠিক সেভাবে পবিত্র করে যেভাবে একটি পরিস্কার ও স্বচ্ছ নদীর পানি ময়লা কাপড়কে বিধৌত করে। এমন কে আছে যে পূর্ণ আন্তরিকতাসহ আমাদের কাছে এসেছে, অথচ সেই আলো প্রত্যক্ষ করেনি? এবং কে সেই ব্যক্তি যে সদিচ্ছার সাথে এই দরজার কড়া নেড়েছে অথচ তার জন্য দরজা খোলা হয়নি? কিন্তু পরিতাপ! অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হলো, তারা ইতর জীবনকেই পছন্দ করে আর আলো তাদের অন্ত:করণে প্রবেশ করুক তা তারা চায় না।" (চশমায়ে মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৩০১-৩০৩)

পুনরায় চশমায়ে মা'রেফাত পুস্তকেই তিনি (আ.) বলেন, "এখন চিন্তা করা উচিত, এই সম্মান, এই মহিমা, এই সৌভাগ্য, এই প্রতাপ, সহস্র সহস্র স্বর্গীয় নিদর্শন এবং এই ঐশী কল্যাণরাজি একজন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে কী? আমরা খুবই গর্বিত, যেই নবী (সা.)-এর আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি, তাঁর ওপর খোদার অসাধারণ কৃপা রয়েছে। তিনি খোদা নন কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর যে ধর্ম আমরা প্রাপ্ত হয়েছি তা খোদা তা'লার শক্তিমত্তা দর্শনের আয়না। যদি ইসলাম না থাকতো, তাহলে এযুগে এটা বোঝা অসম্ভব ছিল যে, নবুয়্যত কাকে বলে। নিদর্শনাবলী লাভ করাও কী সম্ভব? আর সেগুলো কী প্রকৃতির নিয়মের অংশ? এই রহস্যকে সেই নবীর চিরস্থায়ী কল্যাণধারাই উন্মোচন করেছে। আর তাঁর কল্যাণেই এখন আমরা অন্যান্য জাতির মত শুধু কাহিনীবেত্তা নই, বরং

খোদা তা'লার জ্যোতি এবং খোদার স্বর্গীয় সাহায্য আমাদের সঙ্গী। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কী-ই বা যোগ্যতা রাখি? সেই খোদা, যিনি অন্যদের জন্য দৃষ্টির আড়ালে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি অন্যদের দৃষ্টি হতে যা যোজন যোজন দূরে, সেই প্রতাপান্বিত খোদা এই সম্মানিত রসূলের মাধ্যমে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছেন।" (চশমায়ে মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃ৩০১-৩০৩)

অতএব এসব আলেমের তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি হল, মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার আনুগত্য এবং সত্যিকার প্রেমের কারণে আল্লাহ্ তা'লা কেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এর সাথে বাক্যালাপ করলেন আর প্রচ্ছন্ন ও সুপ্ত শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর নৈকট্য কেন প্রদান করলেন? অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা আহমদীয়া জামাত নয় বরং এই নামধারী আলেমরাই একথা বলার অপরাধে অভিযুক্ত যে, এখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণধারা বন্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তা'লার শক্তি এবং গুণাবলী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে! কাজেই অপবাদ যদি কারো প্রতি বর্তায়, তাহলে এদের ওপরই বর্তাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার শক্তি-মত্তা এখনও সেভাবেই বিরাজমান যেমন ছিল আদিতে।

চশমায়ে মা'রেফাত পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর চিরন্তন কল্যাণধারা সম্পর্কে আরো বলেন, **"এরপর আমাদের মহা-সম্মানিত নবী পৃথিবীতে যখন আবির্ভূত হন, পৃথিবীতে তখন এক মহান বিপ্লব সাধিত হয়, আর স্বল্পসময়ে আরব উপদ্বীপ, যা প্রতিমা পূজা ছাড়া কিছুই জানত না, তা খোদার একত্ববাদে এক সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হয়ে ওঠে। এছাড়াও বিস্ময়কর বিষয় হলো, আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যত নিদর্শন এবং মু'জিযা লাভ করেছেন তা শুধু সেই যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং কিয়ামত পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত রয়েছে। পূর্ববর্তী যুগে, নবী যে-ই হত, সে পূর্বের কোন নবীর উম্মত আখ্যায়িত হতো না, এমনকি তার ধর্মের সাহায্য করলেও বা তাকে সত্য জানলে বা মানলেও। কিন্তু এই স্বতন্ত্র গৌরব কেবল মুহাম্মদ রসূলুল্লহ (সা.)-কেই দেয়া হয়েছে। প্রধানত নবুয়্যতের সকল শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সত্তায় পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে, দ্বিতীয়ত তাঁর পর কোন নতুন শরীয়ত বহনকারী কোন নবী আসবে না এবং তাঁর উম্মতের বাইরেও কোন নবী হবে না। বরং সেই ব্যক্তি যেই কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মান লাভ করে, তা তাঁর কল্যাণে এবং তাঁর মাধ্যমেই এবং সে উম্মতি নবী আখ্যায়িত হয়, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী নয়— এসব অর্থে খাতামুল আম্বিয়া।"** (অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে নিজের উম্মতি নবী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি (আ.) আরো বলেন) **"আমাদের প্রতি মানুষের ফিরে ফিরে আসা এবং আমাদের গ্রহণযোগ্যতার চিত্র দেখুন! আজ অন্ততঃপক্ষে সকল শ্রেণীর বিশ কোটি** (এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের যুগের কথা বলছেন) **মুসলমান তাঁর আনুগত্যের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, বড় বড় প্রতাপশালী বাদশাহ্ যারা জগত জয় করার শক্তি রাখতো, তারা তাঁর চরণে তুচ্ছ দাসের মত লুটিয়ে পড়েছে। আর এখনকার ইসলামী বাদশাহ্রাও তিনি (সা.)-এর সকাশে নিজেদের তুচ্ছ দাসের মত মনে**

করে এবং তাঁর নাম নিলেই দরবার মহলে সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে আসে।” (চশমায়ে মা’রেফত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃ: ৩৮০-৩৮১)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এমন সব অতুলনীয় মর্যাদা তিনি তুলে ধরছেন; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ হল, তিনি না-কি অন্য মুসলমানদের মুসলমানই মনে করেন না। তিনি (আ.) বলেছেন, সারা পৃথিবীর মুসলমান তাঁর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্‌র দাসত্বে গর্ববোধ করে, শুধু আহমদীরাই নয়। অতএব এ হল মহানবী (সা.)-এর মাকাম ও পদমর্যাদা যা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনুধাবন করেছেন এবং জগদ্বাসীকে অবহিত করেছেন আর নিজ অনুসারীদেরকে এর সঠিক মর্মার্থ বুঝিয়েছেন। কাজেই আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী না হতাম তাহলে মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব আর সুমহান মর্যাদার গভীরতা কখনও অনুধাবন করতে পারতাম না। বিরোধীরা বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রথম দিকে এক রকম কথা বলতেন, কিন্তু পরে নিজের চিন্তা-ধারায় পরিবর্তন এনেছেন আর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা শুরু করে দিয়েছেন। এতক্ষণ ধরে বর্ণিত এসব কথা আমি আপনাদের সামনে তাঁর রচনাবলী হতেই তুলে ধরেছি যা তিনি ১৮৮০ থেকে শুরু করে ১৯০৮ পর্যন্ত বা তাঁর মৃত্যুর বছর পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এসব উদ্ধৃতি বা রচনার কোন স্থানে বা একটি স্থানেও কোন ত্রুটি নেই বা এ কথাগুলো এমন নয় যা একটি অন্যটির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বত্র মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে তিনি পূর্বের চেয়েও মহান রূপে তুলে ধরেছেন। কোন স্থানে তিনি নবী হওয়ার দাবি করলে কেবল রসূলুল্লহ্ (সা.)-এর দাসত্বেই সেই দাবি করেছেন।

আল্লাহ্ তা’লা এসব স্বার্থপর মানুষের কবল থেকে উম্মতে মুসলেমাহ্‌কে রক্ষা করুন এবং তারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিককে মান্যকারী হোক। এটিই একটি পন্থা ও একমাত্র মাধ্যম যা উম্মতে মুসলেমাহ্‌র হারিয়ে যাওয়া কাঠামোকে পুনর্বহাল করতে পারবে। আল্লহ্ তা’লা আমাদেরকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক এবং তাঁর বক্তৃতাসমূহ পড়ার ও বোঝার সামর্থ দিন আর সঠিক অর্থে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাঁকে পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি ও বুদ্ধিমত্তায় শানিত করে শক্তি-সামর্থ দান করুন। (সুত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮-১৪ জানুয়ারী ২০১৬, খণ্ড ২৩, সংখ্যা ২, পৃ ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।